প্রাচীন সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

প্রথম প্রকাশ ১৩১৪
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৩৪, শ্রাবণ ১৩৩৯, শ্রাবণ ১৩৪১, শ্রাবণ ১৩৪২, ভাদ্র ১৩৫১
শ্রাবণ ১৩৫৬, আশ্বিন ১৩৫৮, মাঘ ১৩৫৯, শ্রাবণ ১৩৬২, ভাদ্র ১৩৬৪
আষাঢ় ১৩৬৬, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, আশ্বিন ১৩৭১, ফাল্গুন ১৩৭৯
অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, ভাদ্র ১৩৯৫, ভাদ্র ১৩৯৯
মাঘ ১৪০২, কার্তিক ১৪০৭, অগ্রহায়ণ ১৪১১
ফাল্গুন ১৪১৫, পৌষ ১৪১৮, শ্রাবণ ১৪২২
মাঘ ১৪২৬

© বিশ্বভারতী

মূল্য : ৯০.০০ টাকা

ISBN 978-81-7522-062-1

প্রকাশক অমৃত সেন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬ গ্রে স্ট্রিট। কলকাতা ৬

সূচীপত্র

রামায়ণ	৫
মেঘদূত	১৪
কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা	১৮
শকুন্তলা	৩৩
কাদম্বরীচিত্র	৫৫
কাব্যের উপেক্ষিতা	৭২
ধম্মপদং	৮৩

রামায়ণ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা-স্বরূপে রচিত

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ নিজের কল্পনা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি ব্যক্তি উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর-এক শ্রেণীর কা আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন; ইহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে, মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

বস্তুত ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা-উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ-জোড়া দুইটি কাব্য, তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে—কবি আপন কাব্যে এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড [ও অডিসী] ছিল। তাহা সমস্ত গ্রীসের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মতো স্ব স্ব-দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্‌টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'এর ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক্‌-না কেন, তথাপি তাহা দেশের ধন নহে, তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।

অতএব গুটিকয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইঁহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন, ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে।

প্রাচীন আর্যসভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে।

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

এইজন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে ; মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবি-যুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলিমৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে ; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য-সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কী বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক বলে, এইরূপ সাধারণের ধারণা। তাহার কারণ, যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক বীররসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধ-ব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই, যুদ্ধঘটনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার বিষয় নহে।

দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন, পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই। এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কবি যদি রামায়ণে নর-চরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত। সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহুগুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সমগ্ররূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।

কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নারদ কহিলেন—

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যোযুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।

এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যে দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই-সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে

দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষেরই চরম আদর্শ-স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শচরিত-বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ জয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষমাত্র; পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য-আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না; গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য-

সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া, তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে।

যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে, এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে 'রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে' তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয় না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যতসংখ্যক শব্দতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব-উদ্ভাবন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

এ যদি সত্য হয় তবে এ কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে, রামায়ণকথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণকথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর-সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে;

কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে ; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনোই সম্ভব হইত না যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত— যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন, তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ, এবং মহাভারতকেও, আমি বিশেষত এই ভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণ-চরিত্র-সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ -সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজ-কালকার সমালোচনা বাজার-দর যাচাই করা ; কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক। এরূপ যাচাই-ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য

আছে, কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পূজা আচ্ছাদন করিতে কুণ্ঠিত; আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোনো ঐতিহাসিক গৌরব-কাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ কথা বলে নাই যে, বড়ো বাড়াবাড়ি হইতেছে; এ কথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেও সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্‌বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।

যে জাতি খণ্ড সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তিবোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন,

তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন; তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন; মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্য দিকে যাঁহারা বলিয়াছেন 'ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'— যাঁহারা, পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি, উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন— তাঁহাদেরও ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে, মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতা-মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া ক্ষুণ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃত-পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সভ্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বোলপুর
৫ পৌষ ১৩১০

মেঘদূত

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্‌কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল? আর সেই-যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়? আর সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী? অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত নহে— আমরা কেবল সেই-যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুলচরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে— তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনকরেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।

আবার, সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে,

তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশ ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা সিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে, অবন্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারি দিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

অতএব, যক্ষের যে মেঘ নগনদীনগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে পাঠকের বিরহকাতরতায় দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। সেই কবির ভারতবর্ষ, যেখানকার জনপদবধূদিগের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন ভ্রূবিকার শিখে নাই এবং পুরবধূদিগের ভ্রূলতাবিভ্রমে-পরিচিত নিবিড়-পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত্র হইতে কৌতূহলদৃষ্টি মধুকরশ্রেণীর মতো ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখান হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়াছি; এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না।

মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি মনে হয়— এক কালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম; এখন কাহার অভিশাপে, মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথী-বনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিক-প্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীত কাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত

হইয়াছে ; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।

কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে ; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমি-বা কোথায় আর তুমিই-বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সেই আমার বহুভাগ্য ; তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন 'দুঁহু-কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-মুখে চাহিয়া আছি— মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা ; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আনিয়া দেয় না ; আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর!

কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির!' এ কী হইল! যে আমার মনোরাজ্যের লোক সে আজ বাহিরে আসিল কেন! ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরামদাস বলিতেছেন: তেঁই বলরামের, পহু, চিত্ত নহে স্থির। যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না— বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

হে নির্জনগিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে? তোমার তো চেতন অচেতনে পার্থক্য জ্ঞান নাই, কী জানি যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক'!

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

কালিদাস একান্তই সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এ মত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো। এই গল্পগুলি জনসাধারণ-কর্তৃক কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।

মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষ ভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য রাগদ্বেষ হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে। রামায়ণেও তাহাই; পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্তসিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে— সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ত্ব ও পৌরুষের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।

সেইরূপ কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই— তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কালিদাস কোথায় থামিয়াছেন এবং কোথায় থামেন নাই, সেইটে এখনকার আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিবার বিষয়। পথের কোনো-একটা অংশে থামিয়া তাঁহাকে বিচার করা যায় না,

তাঁহার গম্যস্থান কোথায় তাহা দেখিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন সেইখানেই ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা-নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে তাহা য়ুরোপের নাট্যরীতি-অনুসারে অবশ্যঘটনীয় নহে। কারণ, শকুন্তলা-নাটকের আরম্ভে যে বীজবপন হইয়াছে এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার পরেও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন বাহ্য উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের অন্তর্গত কোনো ঘটনাসূত্রে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কোনো ব্যবহারে, এ মিলন ঘটিবার কোনো পথ ছিল না।

তেমনি এখনকার কবি কুমারসম্ভবে হতমনোরথ পার্বতীর দুঃখ ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন। অকালবসন্তের রক্তবর্ণ অশোককুঞ্জে মদনমথনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা তাঁহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন— অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘেরিয়া থাকিত। এখনকার সমালোচকের মতে এইখানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম সূর্যাস্ত, তাহার পরে বিবাহের রাত্রি অত্যন্ত বর্ণচ্ছটাহীন।

বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা, তাহা নিয়মবদ্ধ সমাজের অঙ্গ। বিবাহ এমন একটি পথ নির্দেশ করে যাহার লক্ষ্য একমাত্র ও সরল, এবং যাহাতে প্রবল প্রবৃত্তি দস্যুতা করিতে প্রবল নিষেধ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এখনকার কবিরা বিবাহব্যাপারকে তাঁহাদের কাব্যে বড়ো করিয়া দেখাইতে চান না। যে প্রেম উদ্দাম বেগে নরনারীকে তাহার চারি দিকের সহস্র বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে

সংসারের চিরকালের অভ্যস্ত পথ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়— যে প্রেমের বলে নরনারী মনে করে তাহারা আপনাতেই আপনারা সম্পূর্ণ, মনে করে যে যদি সমস্ত সংসার বিমুখ হয় তবু তাহাদের ভয় নাই, অভাব নাই— যে প্রেমের উত্তেজনায় তাহারা ঘূর্ণবেগে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত গ্রহের মতো তাহাদের চারি দিক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠে, সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয়।

কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত।

কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্রকারুখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত-দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ্র দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্পর্ধিত মদন যে মিলনের কর্তৃত্বভার লইয়াছিল তাহার আয়োজন প্রচুর। সমাজবেষ্টনের বাহিরে দুই তপোবনের মধ্যে অহেতুক আকস্মিক নবপ্রেমকে কবি যেমন কৌশলে তেমনি সমারোহে সুন্দর অবকাশ দান করিয়াছেন।

যতি কৃত্তিবাস তখন হিমালয়ের প্রস্থে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। শীতল বায়ু মৃগনাভির গন্ধ ও কিন্নরের গীতধ্বনি বহন করিয়া গঙ্গাপ্রবাহসিঞ্চিত দেবদারুশ্রেণীকে আন্দোলিত করিতেছিল। সেখানে হঠাৎ অকালবসন্তের সমাগম হইতেই দক্ষিণদিগ্‌বধূ সদ্যপুষ্পিত অশোকের নবপল্লবজাল মর্মরিত করিয়া আতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ভ্রমরযুগল এক কুসুমপাত্রে মধু খাইতে লাগিল এবং কৃষ্ণসারমৃগ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী হরিণীর গাত্র শৃঙ্গদ্বারা ঘর্ষণ করিল।

তপোবনে বসন্তসমাগম। তপস্যার সুকঠোর নিয়মসংযমের কঠিনবেষ্টন-মধ্যে হঠাৎ প্রকৃতির আত্মস্বরূপবিস্তার! প্রমোদবনের মধ্যে বসন্তের বাসন্তকিতা এমন আশ্চর্যরূপে দেখা দেয় না।

মহর্ষি কণ্বের মালিনীতীরবর্তী আশ্রমেও এইরূপ। সেখানে হুত হোমের ধূমে তপোবনতরুর পল্লব-সকল বিবর্ণ, সেখানে জলাশয়ের পথসকল মুনিদের সিক্তবল্কলক্ষরিত জলরেখায় অঙ্কিত এবং সেখানে বিশ্বস্ত মৃগ-সকল রথচক্রধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষকে নির্ভয় কৌতূহলের সহিত শুনিতেছে। কিন্তু সেখান হইতেও প্রকৃতি দূরে পলায়ন করে নাই, সেখানেও কখন্ রুক্ষবল্কলের নীচে হইতে শকুন্তলার নবযৌবন অলক্ষ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধনকে চারি দিক হইতে ঠেলিতেছিল। সেখানেও বায়ুকম্পিত পল্লবাঙ্গুলি-দ্বারা চূতবৃক্ষ যে সংকেত করে তাহা সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে এবং নবকুসুমযৌবনা নবমালিকা সহকারতরুকে বেষ্টন করিয়া প্রিয়মিলনের ঔৎসুক্য প্রচার করে।

চারি দিকে অকালবসন্তের অজস্র সমারোহ, তাহারই মাঝখানে গিরিরাজনন্দিনী কী মোহন বেশেই দেখা দিলেন! অশোককর্ণিকারের পুষ্পভূষণে তিনি সজ্জিতা, অঙ্গে বালারুণবর্ণের বসন, কেসরমালার কাঞ্চী পুনঃপুনঃ স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, আর তিনি ভয়চঞ্চল লোচনে ক্ষণে ক্ষণে লীলাপদ্ম সঞ্চালন করিয়া দুরন্ত ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতেছেন।

অন্য দিকে দেবদারুদ্রুমবেদিকার উপরে শার্দূলচর্মাসনে ধূর্জটি ভুজঙ্গ-পাশ-বদ্ধ জটাকলাপ এবং গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করিয়া ধ্যানস্তিমিতলোচনে অনন্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

অস্থানে অকালবসন্তে মদন এই দুই বিসদৃশ পুরুষ-রমণীর মধ্যে মিলনসাধনের জন্য উদ্যত ছিলেন।

কণ্বাশ্রমেও সেইরূপ। কোথায় বল্কলবসনা তাপসকন্যা এবং কোথায় সসাগরা ধরণীর চক্রবর্তী অধীশ্বর! দেশকালপাত্রকে মুহূর্তের মধ্যেই এমন করিয়া যে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় সেই মীনকেতনের যে কী শক্তি কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কবি সেইখানেই থামেন নাই। এই শক্তির কাছেই তিনি তাঁহার কাব্যের সমস্ত রাজকর নিঃশেষ করিয়া দেন নাই। তিনি যেমন ইহার হঠাৎ জয়সংবাদ আনিয়াছেন তেমনি পরক্ষণেই ইহার হঠাৎ পরাভব প্রচার করিয়াছেন। তিনি অন্য দুর্জয় শক্তি-দ্বারা পূর্ণতর চরম মিলন ঘটাইয়া তবে কাব্য বন্ধ করিয়াছেন। স্বর্গের দেবরাজের দ্বারা উৎসাহিত এবং বসন্তের মোহিনী শক্তির দ্বারা সহায়বান্ মদনকে কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার স্থলে যাহাকে জয়ী করিয়াছেন তাহার সজ্জা নাই, সহায় নাই; তাহা তপস্যায় কৃশ, দুঃখে মলিন। স্বর্গের দেবরাজ তাহার কথা চিন্তাও করেন নাই।

যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ

হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে, দুষ্মন্তই সমস্ত; তখন শকুন্তলার সে প্রেমে আর কল্যাণ রহিল না। যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর-সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে; সেইজন্যই সে প্রেম অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারি দিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্ব-পরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেখে মানবে কেহ আঘাত করে না; আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তু যাহা যতির তপোবনে তপোভঙ্গরূপে, গৃহীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসারধর্মের অকস্মাৎ পরাভব-স্বরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা ঝঞ্ঝার মতো অন্যকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু নিজের বিনাশকেও নিজেই বহন করিয়া আনে।

পর্যাপ্তযৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। মন্দাকিনীর জলে যে পদ্ম ফুটিত সেই পদ্মের বীজ রৌদ্রকিরণে শুষ্ক করিয়া নিজের হাতে গৌরী যে জপমালা গাঁথিয়াছিলেন সেই মালা তিনি তাঁহার তাম্ররুচি করে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে, তাঁহার তিন নেত্রকে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্যন্ত এবং মুখ এক দিকে সাচীকৃত।

কিন্তু অপূর্ব সৌন্দর্যে অকস্মাৎ উদ্ভাসমান এই-যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না, সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

নিজের ললিত যৌবনের সৌন্দর্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কণ্বদুহিতাকেও একদিন তাঁহার যৌবনলাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পদ লইয়া অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। দুর্বাসার শাপ কবির রূপকমাত্র। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যই হয়; তাহার পরে অবসাদের, অপমানের, বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান। কালে কালে দেশে দেশে অপমানিতা নারী 'ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ', আপনার ললিত দেহকান্তিকে ব্যর্থ জ্ঞান করিয়া 'শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ'— শূন্যহৃদয়ে কোনোক্রমে গৃহের দিকে ফিরিয়াছে। ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর পরমগৌরব চরমসৌন্দর্য নহে।

সেইজন্যই 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী', পার্বতী রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। এবং 'ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাম্', তিনি আপনার রূপকে সফল করিতে ইচ্ছা করিলেন। রূপকে সফল করিতে হয় কী করিয়া? সাজে সজ্জায় বসনে অলংকারে? সে পরীক্ষা তো ব্যর্থ হইয়া গেছে।—

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

তিনি তপস্যা-দ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবারে গৌরী তরুণার্করশ্মিম বসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপল্লব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না; তিনি কঠোর মৌঞ্জী-মেখলা-দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

শকুন্তলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাগ্লানিকে দুঃখতাপে দগ্ধ করিয়া কল্যাণী তাপসীর বেশে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা শ্লথলম্বিত-পিঙ্গল-জটা-ধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাকৃত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা আঘাত আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।

এত দিন পরে—

ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি।
পূর্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ॥

ধর্ম যখন মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন তখন পূর্বাপরাধভীত কামের মন আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধর্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে সেখানে মদনের সহিত কাহারো কোনো বিরোধ নাই। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায় তখনি বিপ্লব উপস্থিত হয়; তখনি প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু ধর্মের অধীনে তাহার যে নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ, সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না। কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য, এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে। সৌন্দর্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে

নিজের ললিত যৌবনের সৌন্দর্য অপমানিত হইল জানিয়া লজ্জাকুণ্ঠিতা রমণী কোনোমতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কথদুহিতাকেও একদিন তাঁহার যৌবনলাবণ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পদ লইয়া অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। দুর্বাসার শাপ কবির রূপকমাত্র। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত। উন্মত্ততার উজ্জ্বল উন্মেষ ক্ষণকালের জন্যই হয়; তাহার পরে অবসাদের, অপমানের, বিস্মৃতির অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করে। ইহা চিরকালের বিধান। কালে কালে দেশে দেশে অপমানিতা নারী 'ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ', আপনার ললিত দেহকান্তিকে ব্যর্থ জ্ঞান করিয়া 'শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ'— শূন্যহৃদয়ে কোনোক্রমে গৃহের দিকে ফিরিয়াছে। ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর পরমগৌরব চরমসৌন্দর্য নহে।

সেইজন্যই 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী', পার্বতী রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। এবং 'ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাম্', তিনি আপনার রূপকে সফল করিতে ইচ্ছা করিলেন। রূপকে সফল করিতে হয় কী করিয়া? সাজে সজ্জায় বসনে অলংকারে? সে পরীক্ষা তো ব্যর্থ হইয়া গেছে।—

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

তিনি তপস্যা-দ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবারে গৌরী তরুণার্করশ্মিম বসনে শরীর মণ্ডিত করিলেন না, কর্ণে চূতপল্লব এবং অলকে নবকর্ণিকার পরিলেন না; তিনি কঠোর মৌঞ্জী-মেখলা-দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

শকুন্তলাও দিব্য আশ্রমে মদনের মাদকতাগ্লানিকে দুঃখতাপে দগ্ধ করিয়া কল্যাণী তাপসীর বেশে সার্থক প্রেমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা শ্লথলম্বিত-পিঙ্গল-জটা-ধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাকৃত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা আঘাত আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।

এত দিন পরে—

ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি।
পূর্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ॥

ধর্ম যখন মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন তখন পূর্বাপরাধভীত কামের মন আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধর্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে সেখানে মদনের সহিত কাহারো কোনো বিরোধ নাই। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায় তখনি বিপ্লব উপস্থিত হয়; তখনি প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু ধর্মের অধীনে তাহার যে নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ, সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না। কারণ, ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য, এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া উভয়কে একটি আনন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে। সৌন্দর্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে

ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে সেখানে বাহ্যসৌন্দর্যের বিধান তাহাতে আর খাটে না। সেখানে তাহার আর ভূষণের প্রয়োজন কী? প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাহাকে বাহ্য সৌন্দর্যের নিয়মে বিচার করাই চলে না। শিবের ন্যায় তপস্বী, গৌরীর ন্যায় কিশোরীর সঙ্গে বাহ্যসৌন্দর্যের নিয়মে ঠিক যেন সংগত হইতে পারেন না। শিব নিজেই ছদ্মবেশে সে কথা তপস্যারতা উমাকে জানাইয়াছেন। উমা উত্তর দিয়াছেন 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্', আমার মন তাহাতেই ভাবৈকরস হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এ যে রস এ ভাবের রস; সুতরাং ইহাতে আর কথা চলিতে পারে না। মন এখানে বাহিরের উপরে জয়ী, নিজের আনন্দকে নিজে সৃষ্টি করিতেছে। শম্ভুও একদিন বাহ্য র্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি, মঙ্গলের দৃষ্টি, দৃষ্টি দ্বারা যে সৌন্দর্য দেখিলেন তাহা তপস্যাকৃশ ও আভরণহীন লেও তাঁহাকে জয় করিল। কারণ সে জয়ে তাঁহার নিজের মনই সহায়তা করিয়াছে, মনের কর্তৃত্ব তাহাতে নষ্ট হয় নাই।

ধর্ম যখন তাপস তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল তখন স্বর্গ মর্ত এ প্রেমের সাক্ষী ও সহায়রূপে অবতীর্ণ হইল। এই প্রেমের আহ্বান সপ্তর্ষিবৃন্দকে স্পর্শ করিল; এই প্রেমের উৎসব লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে কোনো গূঢ় চক্রান্ত, অকালে বসন্তের আবির্ভাব ও গোপনে মদনের শরপাতন রহিল না। ইহার যে অম্লান মঙ্গলশ্রী তাহা সমস্ত সংসারের আনন্দের সামগ্রী। সমস্ত বিশ্ব এই শুভমিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দিল।

সপ্তম স্বর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিবাহ-উৎসবেই কুমার-সম্ভবের উপসংহার।

শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে; কালিদাস তাঁহার কাব্যের রসপ্রবাহকে সেই স্বর্গমর্তব্যাপী সর্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মধ্যে

মিলিত করিয়া তাহাকে মহান্ পরিণাম দান করিয়াছেন; তাহাকে অর্ধপথে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' করিয়া রাখিয়া দেন নাই। মাঝে তাহাকে যে একবার বিক্ষুব্ধ করিয়া দিয়াছেন সে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তিকে গাঢ় করিয়া দেখাইবার জন্য, ইহার স্থির শুভ্র মঙ্গলমূর্তিকে বিচিত্রবেশী উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্যের তুলনায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য।

মহেশ্বর যখন সপ্তর্ষিদের মধ্যে পতিব্রতা অরুন্ধতীকে দেখিলেন তখন তিনি পত্নীর সৌন্দর্য যে কী তাহা দেখিতে পাইলেন।—

তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূয়ান্ দারার্থমাদরঃ।
ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্যাণাং সংপত্ত্যো মূলকারণম্॥

তাঁহাকে দেখিয়া শম্ভুর দারগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আদর জন্মিল। সৎপত্নীই সমস্ত ধর্মকার্যের মূলকারণ।

পতিব্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিতা রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে তাহা নিয়ত-আচরিত কল্যাণকর্মের স্থির সৌন্দর্য; শম্ভুর কল্পনানেত্রে সেই সৌন্দর্য যখন অরুন্ধতীর সৌম্যমূর্তি হইতে প্রতিফলিত হইয়া নববধূবেশিনী গৌরীর ললাট স্পর্শ করিল তখন শৈলসুতা যে লাবণ্য লাভ করিলেন, অকালবসন্তের সমস্ত পুষ্পসম্ভার তাঁহাকে সে সৌন্দর্য দান করিতে পারে নাই।

বিবাহের দিনে গৌরী—

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্ত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
নিবৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে॥

মঙ্গলস্নানে নির্মলগাত্রী হইয়া যখন পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করিলেন তখন বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুধার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এই যে মঙ্গলকান্তি, নির্মল শোভা, ইহার মধ্যে কী শান্তি, কী শ্রী, কী সম্পূর্ণতা! ইহার মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান, সমস্ত সজ্জার শেষ

পরিণতি। ইহার মধ্যে ইন্দ্রসভার কোনো প্রয়াস নাই, মদনের কোনো মোহ নাই, বসন্তের কোনো আনুকূল্য নাই ; এখন ইহা আপনার নির্মলতায়, মঙ্গলতায় আপনি অক্ষুব্ধ, আপনি সম্পূর্ণ।

জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশের একটি পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। সেইজন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ', তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব-কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাঁধ ভাঙিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে ; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন। এইজন্য কবি প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য-স্থলে ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্যমোহের স্থলে কল্যাণের কমনীয় দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনভূমির স্থলে আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করাইয়াছেন— তবে কুমারজন্মের সূচনা হইয়াছে। কুমারজন্মব্যাপারটা কী তাহাই বুঝাইতে কবি মদনকে দেবরোষানলে আহুতি দিয়া অনাথা রতিকে বিলাপ করাইয়াছেন।

শকুন্তলাতেও প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্মন্তের ব্যর্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরতজননীর সঙ্গে তাঁহার সার্থক মিলন কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্ক চাঞ্চল্যে ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ ; তাহাতে উদ্‌বেলযৌবনা ঋষিকন্যা, কৌতুকোচ্ছলিত সখীদ্বয়, নবপুষ্পিতা বনতোষিণী, সৌরভভ্রান্ত মূঢ় ভ্রমর এবং তরু-অন্তরালবর্তী মুগ্ধ রাজা তপোবনের একটি নিভৃত প্রান্ত আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্যমদমোদিতা এক অপরূপ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এই প্রমোদস্বর্গ হইতে দুষ্মন্তপ্রেয়সী অপমানে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণরূপিণী ভরতজননী যে দিন তপোভূমিতে আশ্রয় লইয়াছেন

সেখানকার দৃশ্য অন্যরূপ। সেখানে কিশোরী তাপসকন্যারা আলবালে জল সেচন করিতেছে না, লতাভগিনীকে স্নেহদৃষ্টি-দ্বারা অভিষিক্ত করিতেছে না, কৃতকপুত্র মৃগশিশুকে নীবারপুষ্টি-দ্বারা পালন করিতেছে না। সেখানে তরুলতাপুষ্পপল্লবের সমুদয় চাঞ্চল্য একটিমাত্র বালক অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সমস্ত বনভূমির কোল সে ভরিয়া রহিয়াছে। সেখানে সহকারশাখায় মুকুল ধরে কি না, নবমল্লিকায় পুষ্পমঞ্জরি ফোটে কি না, সে কাহারো চক্ষেও পড়ে না। স্নেহব্যাকুলা তাপসী মাতারা দুরন্ত বালকটিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার সহিত পরিচয় হইবার পূর্বে দূর হইতে তাহার নবযৌবনের লাবণ্যলীলা দুষ্মন্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। শেষ অঙ্কে শকুন্তলার বালকটি শকুন্তলার সমস্ত লাবণ্যের স্থান অধিকার করিয়া লইয়া রাজার অন্তরতম হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিল।

এমন সময়—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ

মলিনধূসরবসনা, নিয়মচর্যায় শুষ্কমুখী, একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা শকুন্তলা প্রবেশ করিলেন। এমন তপস্যার পর অক্ষয়বরলাভ হইবে না! সুদীর্ঘব্রতচারণে প্রথম সমাগমের গ্লানি দগ্ধ হইয়া পুত্র-শোভায় পরমভূষিতা যে করুণকল্যাণচ্ছবি জননীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে কে প্রত্যাখ্যান করিবে!

ধূর্জটির মধ্যে গৌরী কোনো অভাব, কোনো দৈন্য দেখিতে পান নাই। তিনি তাঁহাকে ভাবের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে দৃষ্টিতে ধন রত্ন রূপ যৌবনের কোনো হিসাব ছিল না। শকুন্তলার প্রেম সুতীব্র অপমানের পরেও মিলনকালে দুষ্মন্তের কোনো অপরাধই লইল না, দুঃখিনীর দুই চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল। যেখানে প্রেম নাই সেখানে অভাবের, দৈন্যের, কুরূপের সীমা নাই; যেখানে প্রেম

নাই সেখানে পদে পদে অপরাধ। গৌরীর প্রেম যেমন নিজের সৌন্দর্য-সম্পদে সন্ন্যাসীকে সুন্দর ও ঈশ্বর করিয়া দেখিয়াছিল, শকুন্তলার প্রেমও সেইরূপ নিজের মঙ্গলদৃষ্টিতে দুষ্মন্তের সমস্ত অপরাধকে দূর করিয়া দেখিয়াছিল। যুবকযুবতীর মোহমুগ্ধ প্রেমে এত ক্ষমা কোথায়? ভরতজননী যেমন পুত্রকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন, সহিষ্ণুতাময়ী ক্ষমাকেও তেমনি শকুন্তলা তপোবনে বসিয়া আপনার অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বালক ভরত দুষ্মন্তকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এ কে আমাকে পুত্র বলিতেছে?' শকুন্তলা উত্তর করিলেন, 'বাছা, আপনার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা করো'— ইহার মধ্যে অভিমান ছিল না— ইহার অর্থ এই যে 'যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে ইহার উত্তর পাইবে'— বলিয়া রাজার প্রসন্নতার অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। যেই বুঝিলেন দুষ্মন্ত তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছেন না তখনি নিরভিমানা নারী বিগলিত চিত্তকে দুষ্মন্তের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন, নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কাহারো কোনো অপরাধ দেখিতে পাইলেন না। আত্মাভিমানের দ্বারা অন্তকে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহার দোষ ত্রুটি বড়ো হইয়া উঠে; ভাবের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিলে সে-সমস্ত কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

যেমন শ্লোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলের জন্য অন্য চরণের অপেক্ষা করে তেমনি দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতালাভের জন্য এই দ্বিতীয় মিলনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা রাখে। শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে দুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে, কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কী দশা ঘটে! শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের বাহ্যরীতি-অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।

দেখা গেল, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই।

উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত ; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ— বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্য হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা-অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্রসৌভাগ্য-রূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।

এক দিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্য দিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না ; তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই— দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ, আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ-আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে

আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য, শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান, তাহা গভীরতার দিকে নিস্তব্ধ একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে— এইজন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান ও বিস্ময়কর।

পৌষ ১৩০৮

শকুন্তলা

শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পেস্ট-নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপসকুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনাস্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই। কিন্তু কাব্য-রসে স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন; তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকে এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা-কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে— পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র

সৌন্দর্যে পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্য সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়— তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্ক-বর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোনো ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোনো চরিত্রের বিকাশ নহে; ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া— প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গটি আমরা অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বর্গ ও মর্তের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্তের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই। তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান তাহা দুষ্মন্ত শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবনমত্ততার হাবভাব-লীলা-চাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনিত না, এইজন্যই তাহার মর্ম-স্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্মন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই। যেমন, যে অরণ্যে সর্বদাই শিকার হইয়া থাকে সেখানে

ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্বদাই সহজেই মিলন হইয়া থাকে সেখানে মীনকেতুকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনে হরিণী যেমন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।

শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে তেমনি সেই পরাভব সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায় তাহার ধুলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না। কিন্তু অরণ্যফুলের ধুলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না— সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধুলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে। শকুন্তলাকেও ধুলা লাগিয়াছিল, কি তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই; সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়-বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক দিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্মের অনুগতা, আবার অন্য দিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, সে একাগ্র-তপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা; ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা,

সৌন্দর্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান। গান্ধর্ববিবাহ ব্যাপারটিও তেমনি—তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা-নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখদুঃখ মিলনবিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসাচক্ষুর অবিকল সাদৃশ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত শকুন্তলার সে নির্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্ধিত; তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদান-প্রদানে, হাস্যে পরিহাসে কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশলাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইরূপই সংগত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে সম্বন্ধে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও

শিখিয়াছে। কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিস। তাহার সরলতা গভীরতর; তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোনো অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কবি তাহা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জানে না তাহা নহে; কারণ তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত। বাহিরের সম্বন্ধে শকুন্তলা অনভিজ্ঞ বটে, তবু অজ্ঞ নহে। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে। দারুণতম বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্যে ক্ষমায় কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসারজ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই— আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন।

এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সহিত তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশবধাত্রী ভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জন

দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরির সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই; তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয়-ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়। আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরী-হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দুষ্মন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিত বেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুম-যৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধ দৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে

তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্মনিয়মের যেমন মিলন মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায় কিন্তু মানবশক্তির দ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রা-কালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন; শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি সদ্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই; শকুন্তলায় গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল 'ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ' তখন কাব্যের একটি মূল সুর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমমৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন—

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর!

কোথা হে মহারাজ,
মৃগের প্রাণ,
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!

এ কথা শকুন্তলা সম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়শর-নিক্ষেপ নিদারুণ! প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন— কত কঠিন অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে— আর এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই সুকুমার ও সুকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতর বাক্যে রক্ষণীয় শকুন্তলাও তেমনি। ঘৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।

মৃগের প্রতি এই করুণাবাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই দেখি, বল্কলবসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহ-সেবার কর্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসনে নহে, ভাবে ভঙ্গিতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্মন্ত বলিয়াছেন—

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন!

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্যসংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম, অতিথিসেবা, সখী-স্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল। তাহা এমনি অখণ্ড, এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলই আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়। দুষ্মন্তকে দুই উদ্যত বাহুর দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না— এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যটি ভাঙিয়ো না!

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে তখন প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্তরব উঠিল 'ভো ভো তপস্বিগণ, তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও। মৃগয়া-বিহারী রাজা দুষ্মন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।'

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন, এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। কিন্তু তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন, 'ওগো সন্নিহিত তপোবনতরুগণ—

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়!'

চেতন অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন!

শকুন্তলা কহিল, 'হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।'

প্রিয়ংবদা কহিল, 'তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর তাহা নহে, তোমার আসন্নবিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা—

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর

খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।'

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, 'তাত, এই-যে কুটিরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূ, এ যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করিবে তখন সেই প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।'

কণ্ব কহিলেন, 'আমি কখনো ভুলিব না।'

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, 'আরে, কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে।'

কণ্ব কহিলেন, 'বৎসে—

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে,
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।'

শকুন্তলা তাহাকে কহিল, 'ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস! প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল তখন হইতে আমিই তোকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা।'

এইরূপে সমুদয় তরুলতা-মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর

কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া, পর করিয়া ভাবে— যেখানে মানুষ আপনার চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।

উত্তররামচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেস্ট-নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতি-যোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই; বিশ্বকে খর্ব করিয়া দমন করিয়া, আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ব বিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সেখানে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কোনোমতে রক্ষা পাইয়া যে কয়জন প্রাণী তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এই শূন্যপ্রায় দ্বীপের ভিতরে আধিপত্য লইয়া ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন হত্যার চেষ্টা। পরিণামে তাহার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু শেষ হইল এ কথা কেহই বলিতে পারে না। দানবপ্রকৃতি ভয়ে শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল। যাহার যাহা

প্রাপ্য সম্পত্তি সে তাহা পাইল। কিন্তু সম্পত্তিলাভ তো বাহ্য লাভ, তাহা বিষয়ীসম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতে পারে, কাব্যের তাহা চরম পরিণাম নহে।

টেম্পেস্ট-নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেই-রূপ। মানুষে প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে মানুষে বিরোধ— এবং সে বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্বাধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন-পীড়নের দ্বারা এই-সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্র পশুর মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হয়। কিন্তু এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমত কাজ চালাইবার প্রণালী মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধা ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্য-সাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালোকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। ফলাফলনির্ণয় ও বিভীষিকা দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ— তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে— কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায়। তাহা স্বভাবনিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্ক ক্ষালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রুবর্ষণে নির্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই। তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন, এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ

স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দুর্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্ত নিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ করিয়াছেন এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখবেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস এই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটুখানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপনমনে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরি চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি!

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে, তাহার পূর্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষিবৃদ্ধ কণ্বের আশীর্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিগ্ধকরুণ বড়ো পবিত্রমধুর ভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেমের, যে গৃহের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে পরবর্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল 'এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি'

রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ— আমরা একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য, তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বলো, বড়ো নিপুণ-ভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ।··· যাও, বেশ নাগরিক বৃত্তি-দ্বারা এই কথাটি তাঁহাকে বলিবে।'

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর-এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম; সেখানকার যে নিয়ম এখানকার সে নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কী করিয়া! সেখানে যে ব্যাপারটি সহজ সুন্দরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল এখানে তাহার কী দশা হইবে তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল, এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। ঋষিশিষ্য শারঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম!' শারদ্বত কহিলেন, 'তৈলাক্তকে দেখিয়া স্নাত ব্যক্তির, অশুচিকে দেখিয়া শুচি ব্যক্তির, সুপ্তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের, এবং বদ্ধকে দেখিয়া স্বাধীন পুরুষের যে ভাব মনে হয়, এই-সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে।'— একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে

পারিলেন।— পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এইভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, যাহাতে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ অতিমাত্র আঘাত না করে। হংসপদিকার সরল করুণ গীত এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল তখন এই তপোবনের দুহিতা, বিশ্বস্ত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মতো, বিস্ময়ে ত্রাসে বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে-বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে-একটি তপোবন লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দিক হইতে চিরদিনের জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল; শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গৌতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কোথায় সেই-সকল তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, মাধুর্যের যোগ, সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্মল জীবন! এই এক মুহূর্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সংগীতধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল।

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা! যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাহার চারি দিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত সে আজ কী একাকিনী! তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর

নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যথাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদ মাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্ত-ভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল; সে শকুন্তলা আর রহিল না। এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারি দিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব, কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন; এবং এই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্মন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে শকুন্তলা-লাভের কোনো গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা,

তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয় তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘ দুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্মন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন তবে শকুন্তলা হৃৎসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে। সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।

শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠুরতারপ্রত্যভিঘাতেই দুষ্মন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না, অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই; তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়া এ সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন— এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন; বাহির হইতে তাহাকে ছাই-চাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসংকার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে, পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তি লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না

করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখে-কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত এবং স্বর্গ, যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছ্রসাধন-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে বাহিরের ক্লেশ। কেবল কাঠের বোঝা বহন করিয়া পরীক্ষার শেষ হয় না। আভ্যন্তরিক কী উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিমাকে নিজের ভিতর হইতেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি ভঙ্গুরতাকে চাপ-প্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই; সংসারে বিধাতার বিধানে পাপও যে কী মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত আছে, কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতা মৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং সৌন্দর্য, কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিশীর্ণ ভ্রষ্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদু এবং অরক্ষিত। যদিও তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদ্যঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভালো; ইহা

চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি নাই; অপরাধ মত্ত গজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল; আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল। বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেই স্বর্গ যখন জিত হইল তখন আর কোনো শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবন এইরূপ। শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ, জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নে লোকলোকান্তরব্যাপী বিরাম। পাপে অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয় এবং অনুতাপে বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা-কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য সংযম আমরা আর-কোনো নাটকেই দেখি নাই। প্রবৃত্তির প্রবলতা-প্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তি যে কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহা অতিশয়োক্তি-দ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালোবাসেন। শেক্‌স্‌পীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্তগম্ভীর, এমন সংযতসম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে

তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাহার অধিকাংশই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আল্‌গা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত তিনি সেইখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোনো খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থা আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়কালে কী সকরুণ গাম্ভীর্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনই আবার অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে ভয় লজ্জা অভিমান অনুনয় ভর্ৎসনা বিলাপ সমস্তই আছে অথচ কত অল্পের মধ্যে। যে শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জন দিয়াছিল দুঃখের সময় দারুণ অপমান-কালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্‌ভ মর্যাদা এমন আশ্চর্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল। এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর! কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীরতপোবন নীরব, সর্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর-কোনো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে? দুষ্মন্তের অপরাধকে দুর্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখা, সেও কবির সংযম। দুষ্ট প্রবৃত্তি দুরন্তপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

দুষ্মন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন তখন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল—

মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে—এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়। কালিদাস তখনই ধর্মারণ্যের, কাব্য-কাননের, এই মূর্তিমান বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন; ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের 'পরে সমস্ত দাবি কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবি নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই। পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই। কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্য মূর্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা-নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত

পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণনিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন-কি, তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনো-বা তাহা শকুন্তলার যৌবনলীলায় আপনার লীলামাধুর্য অর্পণ করিয়াছে; কখনো-বা মঙ্গল-আশীর্বাদের সহিত আপনার কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করিয়াছে। কখনো-বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক-বিদায়-বাক্যের করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্মলতা, একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের রশ্মি, নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলা-কাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধ ভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে কাজ টেম্পেস্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে। তাহা সৌন্দর্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।

টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার উপরে। শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্বার বলি, শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্তকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

আশ্বিন ১৩০৯

কাদম্বরীচিত্র

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। অন্য দেশে নগর হইতে সভ্যতার সৃষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে। বসনভূষণ— ঐশ্বর্যের গৌরব— সর্বত্রই আছে, আর বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেই। অন্যান্য দেশ ধর্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার বিহার আচারে স্বাধীন; ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার বিহার আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখানো যাইতে পারে, সাধারণ মানবপ্রকৃতি হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। সেই অসামান্যতার আর-একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভালোবাসে; কিন্তু কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেরই গল্প শুনিতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না; যদি-বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। বর্ণনা তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল। কারণ, প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না। পর্বতশৃঙ্গ হইতে নদী যদি-বা শৈবাল বহন করিয়া না আনে, তথাপি তাহার স্রোত ক্ষীণবেগ হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায়। ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। কিষ্কিন্ধ্যা এবং সুন্দর -কাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব

নাই এ কথা মানি, তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অত বড়ো একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে। কেনই-বা সে মার্জনা করে? কারণ, গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে, প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে, ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারোটি বিপুল-আয়তন পর্ব অকাতরচিত্তে মৃদুমন্দগতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না।

আবার, গল্প শুনিবার আগ্রহ-অনুসারে গল্পের প্রকৃতিও ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ছয়টি কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে একটিমাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসংকোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার! আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এই দেখিয়া আসিলাম যে, অধর্মাচারী নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরম শত্রু। অসাধারণ শৌর্যে ও বিপুল আয়োজনে সেই ভয়ংকর রাবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন তখন আমাদের সমস্ত চিন্তা দূর হইল; আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে কবি দেখাইয়া দিলেন, সীতার চরম শত্রু অধার্মিক রাবণ নহে, সে শত্রু ধর্মনিষ্ঠ রাম; নির্বাসনে তাঁহার তেমন সংকট ঘটে নাই, যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামীর গৃহে। যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল ঘাটের পাষাণে ঠেকিবামাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল। গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্যপ্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যু হইতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মহাভারতেও তাই। এক স্বর্গারোহণ-পর্বেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধটার স্বর্গ-

প্রাপ্তি হইল। গল্পপ্রিয় ব্যক্তির কাছে গল্পের অবসান যেখানে মহাভারত সেখানে থামিলেন না, অত বড়ো গল্পটাকে বালুনির্মিত খেলাঘরের মতো এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সংসারের প্রতি এবং গল্পের প্রতি যাহাদের বৈরাগ্য তাহারা ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল, এবং ক্ষুব্ধ হইল না। মহাভারতকে যে লোক গল্পের মতো করিয়া পড়িতে চেষ্টা করে সে মনে করে অর্জুনের শৌর্য অমোঘ, সে মনে করে শ্লোকের উপর শ্লোক গাঁথিয়া মহাভারতকার অর্জুনের জয়স্তম্ভ অভ্রভেদী করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু সমস্ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হঠাৎ একদিন এক স্থানে অতি অল্প কথার মধ্যে দেখা গেল একদল সামান্য দস্যু কৃষ্ণের রমণীদিগকে অর্জুনের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল, নারীগণ কৃষ্ণ সখা পার্থকে আহ্বান করিয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন- অর্জুন গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। অর্জুনের এমন অভাবনীয় অবমাননা যে মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ববর্তী অন্তগুলা পর্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু কাহারো উপর কবির মমতা নাই। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া অনাসক্ত, সেখানে কবিও নির্মম এবং কাহিনীও কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ভার মোচন করিয়া দ্রুতবেগ অবলম্বন করে না।

তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে একেবারে কালিদাসে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জনের জন্য কী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। উৎসবে যে মাটির প্রদীপের সুন্দর দীপমালা রচনা হয় পরদিন তাহা কেহ তুলিয়া রাখে না; ভারতবর্ষের আনন্দ-উৎসবে নিশ্চয়ই এমন অনেক মাটির প্রদীপ, অনেক ক্ষণিক সাহিত্য, নিশীথে আপন কর্ম সমাপন করিয়া প্রত্যূষে বিস্মৃতিলোক লাভ করিয়াছে। কিন্তু

প্রথম তৈজস প্রদীপ দেখিলাম কালিদাসের ; সেই পৈতৃক প্রদীপ এখনো আমাদের ঘরে রহিয়া গেছে। আমাদের উজ্জয়িনীবাসী পিতামহের প্রাসাদশিখরে তাহা প্রথম জ্বলিয়াছিল, এখনো তাহাতে কলঙ্ক পড়ে নাই। কেবল আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি খণ্ডকাব্যের কথা বলিতেছি, নাটকের কথা নহে।) মেঘদূত তাহার এক দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বোধ করি আর নাই। যাহা আছে তাহা মেঘদূতেরই আধুনিক অনুকরণ, যথা পদাঙ্কদূত প্রভৃতি এবং তাহাও পৌরাণিক। কুমারসম্ভব রঘুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নহে, কাব্য। তাহা চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত, তাহার পাঠ-ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন নাই। ভারতবর্ষীয় আর্যসাহিত্যের ধর্ম-প্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন, আশা করি, ঋতুসংহার-পাঠে মোক্ষলাভের সহায়তা হইবে এমন উপদেশ কেহ দিবেন না।

কিন্তু তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই ; যেটুকু আছে সে সূত্রটি অতি সূক্ষ্ম এবং প্রচ্ছন্ন, এবং তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্য-হস্ত হইতে কোনো উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না-পাইলেন সে সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না ; তাঁহাকে তাড়া দিবার লোকও কেহ নাই। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময় শক-হূন-রূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন নায়ক ছিলেন ; অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গ তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু, কই? রাজসভার শ্রোতারা দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন। মদনভস্ম, রতিবিলাপ, উমার তপস্যা, কোনোটাতেই ত্বরান্বিত হইবার জন্য কোনো উপরোধ দেখি না। সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক্, এখন ঐ বর্ণনাটাই

চলুক। রঘুবংশও বিচিত্র বর্ণনার উপলক্ষ মাত্র।

রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত। হায়, অবন্তী-রাজ্যের নববর্ষার দিনে উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা যে গল্প করিতেন সে সমস্ত গেল কোথায়? আসল কথা গ্রামবৃদ্ধেরা তখন গল্প করিতেন, কিন্তু সে গ্রামের ভাষায়। সে ভাষায় যে কবিরা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অমরতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের কবিত্ব অল্প ছিল বলিয়া যে তাঁহারা বিনাশ পাইয়াছেন এমন কথা বলি না। নিঃসন্দেহ তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহাকবি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম্যভাষা প্রদেশবিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিত-মণ্ডলী-কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। সে ভাষায় যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোনো স্থায়ী ভিত্তি পান নাই; নিঃসন্দেহ অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যপুরী চলন-শীল পলি-মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরেজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে lyrics বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভবে না। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে তাহাতেও গানের লঘুতা সরলতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না। বাঙালি জয়-দেব সংস্কৃত ভাষাতেও গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।

মৃত ভাষায়, পরের ভাষায়, গল্পও চলে না; কারণ, গল্পে লঘুতা এবং গতিবেগ আবশ্যক। ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মতো বহন করিয়া চলিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।

কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মতো সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না। তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত; একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

তা ছাড়া, সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে— তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কন্‌সর্ট বাজিয়া উঠে— তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবিপণ্ডিতেরা বাঙ্‌-নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়; বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরি লইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। ময়ূরপুচ্ছনির্মিত এমন অনেক সুন্দর ব্যজন আছে যাহাতে ভালো বাতাস হয় না, কিন্তু বাতাস করিবার উপলক্ষ মাত্র লইয়া রাজসভায় কেবল তাহা শোভার জন্য সঞ্চালন করা হয়। রাজসভার সংস্কৃত কাব্যগুলিও ঘটনাবিন্যাসের জন্য তত অধিক ব্যগ্র হয় না; তাহার বাগ্‌বিস্তার উপমাকৌশল বর্ণনানৈপুণ্য রাজসভাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চমৎকৃত করিতে থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই-তিনখানি উপন্যাস আছে তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যেমন রমণীর তেমনি পদ্যেরও অলংকারের প্রতি টান বেশি; গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতই কর্ম-ক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়,

ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়— এইজন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহ্য-শোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলা-ফেরার জন্য সে হয় নাই ; বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক, কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।

সেইজন্য বাণভট্ট যদিচ স্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই সংস্কৃত ভাষাকে অনুচরপরিবৃত সম্রাটের মতো অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায়ভাবে ছত্র বহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র। ভাষার রাজমর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই সে আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই।

শূদ্রক রাজা কাদম্বরী-গল্পের নায়ক নহেন— তিনি গল্প শুনিতেছেন মাত্র। অতএব তাঁহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে কোনো ক্ষতি ছিল না। আখ্যায়িকার বহিরংশ যদি যথোপযুক্ত হ্রস্ব না হয় তবে মূল আখ্যানের পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় আমাদের কল্পনা-শক্তিও সীমাবদ্ধ। আমরা কোনো জিনিসের সমস্তটা একসঙ্গে সমান করিয়া দেখিতে পাই না— সম্মুখটা বড়ো দেখি ; পশ্চাৎটা ছোটো দেখি ; পৃষ্ঠদেশটা দেখি না, অনুমান করিয়া লই। এইজন্য শিল্পী তাঁহার সাহিত্য-শিল্পের যে অংশটা প্রধানত দেখাইতে চান সেইটাকে বিশেষ-রূপে গোচরবর্তী করিয়া বাকি অংশগুলিকে পার্শ্বে, পশ্চাতে এবং অনুমানক্ষেত্রে রাখিয়া দেন। কিন্তু কাদম্বরীকার মুখ্য-গৌণ ছোটো-বড়ো

কোনো কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে চান নাই। তাহাতে যদি গল্পের ক্ষতি হয়, মূল প্রসঙ্গটি দূরবর্তী হইয়া পড়ে, তাহাতে তিনি বা তাঁহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন— তথাপি কথা কিছু বাদ দিলে চলিবে না— কারণ, কথা বড়ো সুনিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য, কৌশলে মাধুর্যে গাম্ভীর্যে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্যমাণ।

অতএব মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধ্বনির মতো কথা আরম্ভ হইল। আসীদশেষ নরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ— কিন্তু, হায় আমার দুরাশা! কাদম্বরী হইতে সমগ্র পদ উদ্ধার করিয়া কাব্যরস আলোচনা করিব আমার ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের এমন শক্তি নাই। আমরা যে কালে জন্মিয়াছি এ বড়ো ব্যস্ততার কাল; এখন সকল কথার সমস্তটা বলিবার প্রলোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়। কাদম্বরীর সময়ে কবি কথা-বিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; এখন আমাদিগকে কথাসংক্ষেপের সমুদয় কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। তখনকার কালের মনোরঞ্জনের জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন ছিল এখনকার কালের মনো-রঞ্জনের জন্য ঠিক তাহার উলটা বিদ্যা আবশ্যক হইয়াছে।

কিন্তু এক কালের মধুলোভী যদি অন্য কাল হইতে মধুসংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে নিজ কালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্য কালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইতেছে; মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরসবিলাসী রাজ্যেশ্বরবিশেষ, রাজসভা-মধ্যে সমাসীন এবং সমানবয়োবিদ্যালংকারৈঃ অখিলকলাকলাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ অগ্রাম্যপরিহাস-কুশলৈঃ কাব্যনাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ বিনয়-ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ। এইরূপ শব্দচর্চায় রসিকপরিবৃত হইয়া থাকিলে লোকে প্রতিদিনের সুখদুঃখ-

সমাকুল যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত কর্মনিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মাতাল যেরূপ আহার ভুলিয়া মদ্যপান করিতে থাকে তাহারাও সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাবের তরলরসপানে বিহ্বল হইয়া থাকে, তখন সত্যের যাথাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কেবল আদেশ হইতে থাকে— ঢালো ঢালো, আরো ঢালো। এখনকার দিনে মনুষ্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি হইয়াছে; লোকটা কে এবং সে কী করিতেছে, ইহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল। এইজন্য ঘরে, বাহিরে, চতুর্দিকে, মানুষের ক্রিয়াকলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমরা তন্ন তন্ন করিয়া পর্যালোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু সেকালে পণ্ডিতই বলো, রাজাই বলো, মানুষকে বড়ো বেশি কিছু মনে করিতেন না; বোধ করি স্মৃতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে এবং একান্তে অবহিতভাবে শাস্ত্রাদি-আলোচনায় তাঁহারা জগৎসংসারে অনেকটা বেশি নির্লিপ্ত ছিলেন। বোধ করি বিধি-বিধান-নিয়ম-সংযমের শাসনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বড়ো একটা প্রশ্রয় ছিল না। এইজন্য রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী সংস্কৃত-সাহিত্যে লোক-চরিত্রসৃষ্টি এবং সংসার-বর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অবলম্বন। রঘুর দিগ্‌বিজয় ব্যাপারে অনেক উপমা এবং সরস বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু রঘুর বীরত্বের বিশেষ একটা চরিত্রগত চিত্র পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। অজ-ইন্দুমতী ব্যাপারে অজ এবং ইন্দুমতী উপলক্ষ মাত্র, তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ মূর্তি সুস্পষ্ট নহে; কিন্তু পরিণয় প্রণয় ও বিচ্ছেদশোকের একটি সাধারণ ভাব ও রস সেই সর্গে উচ্ছলিত হইতেছে। কুমারসম্ভবে হরপার্বতীকে অবলম্বন করিয়া প্রেম সৌন্দর্য উপমা-বর্ণনা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্য ও সংসারের বিশেষত্বের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য থাকাতে ভাষা বর্ণনা মনুষ্যকে ও ঘটনাকে সর্বত্র

আচ্ছন্ন করিয়া আপন রস বিস্তার করিয়াছে। সেই কথাটি স্মরণ রাখিয়া, আধুনিক কালের বিশেষত্ব বিস্মৃত হইয়া কাদম্বরীর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দের সীমা থাকিবে না।

কল্পনা করিয়া দেখো গায়ক গান গাহিতেছে 'চ-ল-ত-রা-আ আ-আ-আ', ফিরিয়া পুনরায় 'চ-ল-ত-রা আ আ আ আ' সুদীর্ঘ তান— শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে গানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী', কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না। সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে রাজকুমারী না চলে তো নাই চলুক, কিন্তু তানটা চলিতে থাক্। অবশ্য, রাজকুমারী কোন্ পথে চলিতেছেন সে সংবাদের জন্য যাহার বিশেষ উদ্‌বেগ আছে তাহার পক্ষে তানটা দুঃসহ; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাও তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান-নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয় অধীর না হইয়া তানটা শুনিয়া লও। কারণ, যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছ এখানে কৌতূহলে অধীর হইয়া ফল নাই; ইহা রসে মাতোয়ারা হইবার স্থান। অতএব স্নিগ্ধজলদ-নির্ঘোষে আপাতত শূদ্রক রাজার বর্ণনা শুনা যাক। সে বর্ণনায় আমরা শূদ্রক রাজার চরিত্রচিত্র প্রত্যাশা করিব না। কারণ, চরিত্র-চিত্রে একটা সীমারেখা অঙ্কিত করিতে হয়, ইহাতে সীমা নাই— ভাষা কল্লোলমুখর সমুদ্রের বন্যার ন্যায় যতদূর উদ্‌বেল হইয়াছে তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদিশা নগরীর রাজা, তথাপি অপ্রতিহতগামিনী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে তিনি 'চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা'। শূদ্রকের মহিমা কতটুকু ছিল সেই ব্যক্তিগত তুচ্ছ তথ্যালোচনায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজকীয় মহিমা কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে সেই কথা যথোচিত সমারোহ-সহকারে ঘোষিত হউক।

সকলেই জানেন, ভাব সত্যের মতো কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা। সেই স্বভাববিপুল ভাষা কাদম্বরীতে পূর্ণবর্ষার নদীর মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ভাষা ও ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত প্লাবিত হইয়া একাকার হইয়া যায় নাই। কাদম্বরীর প্রথম আরম্ভ-চিত্রটিই তাহার প্রমাণ।

তখন ভগবান মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই; নূতন পদ্ম-গুলির পত্রপুট একটু খুলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহার পাটল আভাটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে।

এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইল। এই বর্ণনার আর-কোনো উদ্দে নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রঙ মাখাইয়া দেওয়া এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন দুলাইয়া দেওয়া। একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনী— কথার কী মোহ! অনুবাদ করিতে গেলে শুধু এইটুকু ব্যক্ত হয় যে, তরুণ সূর্যের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম; কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজালে কেবলমাত্র ঐ বিশেষ্য-বিশেষণের বিন্যাসে, একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাতকাল অনতিবিলম্বে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। এ যেমন প্রভাতের তেমনি একটি কথায় তপোবনে সন্ধ্যাসমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করি: দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা। দিনশেষে তপোবনের রক্তচক্ষু ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিরিয়া আসে কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণা। কপিলা ধেনুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়া সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং

শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। সকালের বর্ণনায় যেমন কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাসটুকুর বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্যে এবং সুস্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি বর্ণের উপমাচ্ছলে তপোবনের গোষ্ঠে-ফেরা অরুণচক্ষু কপিলবর্ণ ধেনুটির কথা তুলিয়া সন্ধ্যার যত-কিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে বলিয়া লইয়াছেন।

এমন বর্ণসৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃতকবিগণ লাল রঙকে লাল রঙ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্বরীকারের লাল রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোনো লাল লাক্ষালোহিত, কোনো লাল পারাবতের পদতলের মতো, কোনো লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান। একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্তপক্ষসংপুটে বৃদ্ধহংসে ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণতরক্তরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতাম্ আশাচক্রবালে, গজরুধির-রক্তহরিসটালোমলোহিনীভিঃ, আতপ্তলাক্ষিকতন্তুপাটলাভিঃ, আয়া-মিনীভিরশিশিরকিরণদীধিতিভিঃ, পদ্মরাগশলাকাসম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমাণে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে— একদিন আকাশ যখন প্রভাতসন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মতো রক্তবর্ণ-পক্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্যায় মন্দাকিনীপুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন, দিক্‌চক্রবালে বৃদ্ধ রক্তমৃগের মতো একটি পাণ্ডুতা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে; আর গজরুধিররক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত এবং ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্যরশ্মিগুলি ঠিক যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জনীর ন্যায় গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্র-পুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।

রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে

রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। কথাটা এই যে, ব্যাধ গাছের উপর চড়িয়া নীড় হইতে পক্ষীশাবকগুলিকে পাড়িতেছে— সেই অনুপজাত-উৎপতনশক্তি শাবকগুলির কেমন রঙ? কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্‌ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্‌বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্‌বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতিকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।— কেহ-বা অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটল কান্তি যেন শাল্মলিকুসুমের মতো; কাহারো পদ্মের নূতন পাপড়ির মতো অল্প-অল্প ডানা উঠিতেছে; কাহারো-বা পদ্মরাগের মতো বর্ণ, কাহারো-বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ-উন্মুক্ত-মুখ কমলের মতো, কাহারো-বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে —এই-সমস্ত প্রতিকারে-অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক-একটি ফলের মতো গ্রহণপূর্বক গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিন্যাস নহে, তাহার সঙ্গে করুণা মাখানো রহিয়াছে; অথচ কবি তাহা স্পষ্টত হাহুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই। বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুলির সৌকুমার্যে তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এমন করিলে প্রবন্ধ শেষ হইবে না। কারণ, কাদম্বরীর মধ্যে

প্রলোভন রাশি রাশি— এই কুঞ্জবনের গলিতে গলিতে নব নব বর্ণের পুষ্পিত লতাবিতান, এখানে সমালোচক যদি মধুপানে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার গুঞ্জনধ্বনি বন্ধ হইয়া যাইবে। বাস্তবিক আমার সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবলমাত্র প্রলোভনে পড়িয়া এই পথে আকৃষ্ট হইয়াছি। যে উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম অমনি সেই প্রসঙ্গে কাদম্বরীর সৌন্দর্য আলোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া লইব। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিতেছি, এ পথ সংক্ষিপ্ত নহে, এই রসস্রোতে আত্মসমর্পণ করিলে লক্ষ্যপথে আর শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।

বর্তমান-সংখ্যক প্রদীপে যে চিত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে সেই চিত্র অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার মূল পটটি বর্ণতৈলে অঙ্কিত, বিষয়টি কাদম্বরী হইতে গৃহীত এবং চিত্রকর আমার স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক আত্মীয় শ্রীমান্ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

এ কথা নিশ্চয়, সংস্কৃত সাহিত্যে আঁকিবার বিষয়ের অভাব নাই, কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলাতি ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর-কোনো উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চক্ষু দিয়া দেশী চিত্র-বিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যামিনীপ্রকাশ অল্প বয়সেই সেই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রথম চেষ্টার যথেষ্ট সফলতা দেখিয়াই প্রদীপের শিল্পানুরাগী বন্ধু ও কর্তৃপক্ষ -গণ আগ্রহের সহিত এই চিত্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং আমাকে ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাদম্বরীর যে প্রসঙ্গটি চিত্রে বিবৃত হইয়াছে সেইটি সংস্কৃত হইতে

বাংলায় ব্যাখ্যা করিলেই ইহার উপযুক্ত ভূমিকা হয়। সেই প্রসঙ্গটি কাদম্বরীর ঠিক প্রবেশদ্বারেই। আলোচনা করিতে করিতে ঠিক সেই পর্যন্তই আসিয়াছিলাম, কিন্তু লোভে পড়িয়া নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পুনর্বার সেইখানেই ফেরা যাক।

নবপ্রভাতে রাজা শূদ্রক সভাতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া ক্ষিতিতলনিহিতজানুকরকমলা হইয়া নিবেদন করিল, 'দক্ষিণাপথ হইতে চণ্ডালকন্যা একটি পিঞ্জরস্থ শুক লইয়া কহিতেছে যে, মহারাজ সমুদ্রের ন্যায় সকল ভুবনতলের সর্বরত্নের একমাত্র ভাজন; এই বিহঙ্গটিও একটি পরমাশ্চর্য রত্নবিশেষ বলিয়া দেবপাদমূলে প্রদান করিবার জন্য আমি আগত হইয়াছি, অতএব দেবদর্শনসুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।'

পাঠকগণ মনে করিবেন না প্রতিহারী এত সংক্ষেপে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। অকৃপণা কবিপ্রতিভা তাহার প্রতিও অজস্র কল্পনাবর্ষণ করিয়াছে; তাহার বামপার্শ্বে অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্র লম্বিত থাকাতে তাহাকে বিষধরজড়িত চন্দনলতার মতো ভীষণরমণীয় দেখিতে হইয়াছে, সে শরৎলক্ষ্মীর ন্যায় কলহংসস্তবসনাএবং বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় বেত্রলতাবতী; সে যেন মূর্তিমতী রাজাজ্ঞা, যেন বিগ্রহিণী রাজ্যাধিদেবতা।

সমীপবর্তী রাজগণের মুখাবলোকন করিয়া উপজাতকুতূহল রাজা প্রতিহারীকে কহিলেন, 'তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও।' প্রতিহারী তখন চণ্ডালকন্যাকে সভাতলে উপস্থিত করিল।

সেখানে অশনিভয়পুঞ্জিত-শৈলশ্রেণী-মধ্যগত কনকশিখরী মেরুর ন্যায় নরপতিসহস্রমধ্যবর্তী রাজা। নানা রত্নাভরণকিরণজালে তাঁহার অবয়ব প্রচ্ছন্নপ্রায় হওয়াতে মনে হইতেছে, যেন সহস্র ইন্দ্রায়ুধে অষ্টদিগ্‌বিভাগ

আচ্ছাদিত করিয়া বর্ষাকালের ঘনগম্ভীর দিন বিরাজমান। লম্বিত-স্থূলামুক্তাকলাপ ও স্বর্ণশৃঙ্খলে-বদ্ধ মণিদণ্ডচতুষ্টয়ে অমল শুভ্র অনতিবৃহৎ দুকূলবিতান বিস্তৃত, তাহারই অধোভাগে ইন্দুকান্তমণিপর্যঙ্কে রাজা নিষণ্ণ; তাঁহার পার্শ্বে কনকদণ্ডচামরকলাপ উদ্ধূয়মান, পরাভবপ্রণত শশীর ন্যায় বিশদোজ্জ্বল স্ফটিকপাদপীঠে তাঁহার বামপদ বিন্যস্ত; অমৃত-ফেনের ন্যায় তাঁহার লঘুশুভ্র দুকূলবসনের প্রান্তে গোরোচনার দ্বারা হংসমিথুনমালা অঙ্কিত; অতি সুগন্ধ চন্দনানুলেপনে তাঁহার উরঃস্থল ধবলিত, তাহারই মধ্যে মধ্যে কুঙ্কুমচর্চিত হওয়াতে স্থানে স্থানে নিপতিত প্রভাতরবিকিরণে অঙ্কিত কৈলাসশিখরীর ন্যায় তিনি শোভমান; ইন্দ্রনীল-অঙ্গদ-যুগলে তিনি দুই বাহুতে চপলা রাজলক্ষ্মীকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কর্ণোৎপল ঈষৎ আলম্বিত; মস্তকে আমোদিত মালতীমালা, যেন উষাকালে অস্তাচলশিখরে তারকাপুঞ্জ পর্যন্ত। সেবা-সংগতা অঙ্গনাগণ দিগ্‌বধূর ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

তখন প্রতিহারী নরপতিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য রক্তকুবলয়দলকোমল হস্তে বেণুলতা গ্রহণ করিয়া একবার সভাকুট্টিমে আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ তালফলপতনশব্দে বনকরীযূথের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, আর্যবেশধারী ধবলবসন একটি বৃদ্ধ চণ্ডাল অগ্রে আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে কাকপক্ষধারী একটি বালক স্বর্ণশলাকা-নির্মিত পিঞ্জরে বিহঙ্গকে বহন করিয়া আনিতেছে। এবং তাহার পশ্চাতে নিদ্রার ন্যায় লোচনগ্রাহিণী এবং মূর্ছার ন্যায় মনোহরা একটি তরুণযৌবনা কন্যা— অসুরগৃহীত অমৃত অপহরণের জন্য কপটপটু-বিলাসিনী-বেশধারী ভগবান্ হরির ন্যায় সে শ্যামবর্ণা, যেন একটি সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিপুত্তলিকা; আগুল্‌ফলম্বিত নীলকঞ্চুকের দ্বারা তাহার শরীর আচ্ছন্ন এবং তাহারই উপরে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠনে যেন

নীলোৎপলবনে সন্ধ্যালোক পড়িয়াছে ; একটি কর্ণের উপরে উদয়োন্মুখ ইন্দুকিরণচ্ছটার ন্যায় একটি শুভ্র কেতকীপত্র আসক্ত, ললাটে রক্ত-চন্দনের তিলক, যেন কিরাতবেশা ত্রিলোচনা ভবানী।

আমাদের সমালোচ্য চিত্রের বিষয়টি কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া দিলাম। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরী-কাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে— বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন— এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘন-সংলগ্ন ধারাবাহিক তাহা নহে, এক-একটি ছবির চারি দিকে প্রচুর কারুকার্য-বিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া— ফ্রেম সমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য-আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।

মাঘ ১৩০৬

কাব্যের উপেক্ষিতা

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর-একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের-সর্বসুখ-বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবিকমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না? হায় অব্যক্তবেদনা দেবী উর্মিলা, তুমি প্রভ্যুষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্ত-শিখরী, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

কাব্যসংসারে এমন দুটি-একটি রমণী আছে যাহারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন তাহা পাঠকবিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্ত-ভূমিতে যে-কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে তাহার মধ্যে উর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়া গেছেন, গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে; কারণ, গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণসীমাবদ্ধ, তাহা কেবল

গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়-দ্বারা পাই না, কল্পনা-দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টি-কার্যে সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয়, দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

উর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহ-সভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। উর্মিলা চিরবধূ— নির্বাক্‌কুণ্ঠিতা, নিঃশব্দচারিণী। ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবারমাত্র তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, ইনি কে?' লক্ষ্মণ লজ্জিত হাস্যে মনে-মনে কহিলেন, 'ওহো, উর্মিলার কথা আর্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন; তাহার পর রামচন্দ্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখচিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারো কৌতূহল-অঙ্গুলি এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে তো কেবল বধূ উর্মিলা মাত্র।

তরুণশুভ্র ভালে যেদিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সেদিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণ-মুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না! আর, যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সেদিন বধূ উর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যার বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কি কেহ জানে! সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমান ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল! যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সীতার জন্য উর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; উর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে উর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ তো বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; নারীজীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর উর্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল! সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাশোন্মুখ হৃদয়-মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ-সময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নতদৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন; ·'ন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির

প্রণয়ালোক-বঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল! পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণ-মন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন— জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?

সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়ম্বদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল; নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না; কঠিনহৃদয় কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকার জন্য কত অক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্মমচিত্তে বিসর্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে যাহাকে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয়? দীপ্তরোষ ঋষিশিষ্যদ্বয় এবং হতবুদ্ধি রোরুদ্যমানা গৌতমী যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া উৎসুক উৎকণ্ঠিত সখী-দুইটিকে রাজসভার বৃত্তান্ত জানাইল তখন তাহাদের কী হইল সে কথা শকুন্তলা নাটকের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই অকথিত অমেয় বেদনা সেইখানেই ক্ষান্ত হইয়া গেল? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বিনা ছন্দে বিনা ভাষায় চিরদিন তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল না?

কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি প্রিয়ম্বদা অনসূয়া শকুন্তলার কতখানি ছিল, তখন সেই কণ্বদুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়বিচারসংগত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর।

শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দুটি লাবণ্যপ্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল। তিনটি সখী যখন জলের ঘট লইয়া অকালবিকশিত নবমালতীর তলে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দুষ্যন্ত কি একা শকুন্তলাকে ভালোবাসিয়াছিলেন? তখন হাস্যে কৌতুকে নবযৌবনের বিলোলমাধুর্যে কাহারা শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল? এই দুটি তাপসী সখী। একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো-আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে যেখানে একাকিনী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রেমাকুলতা বর্ণিত আছে সেখানে কবি অনেকটা হীনবল হইয়াছিলেন— কোনোমতে অচিরে গৌতমীকে আনিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন— কারণ, শকুন্তলাকে যাহারা আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছিল তাহারা সেখানে ছিল না। বৃন্তচ্যুত ফুলের উপর দিবসের সমস্ত প্রখর আলোক সহ্য হয় না; বৃন্তের বন্ধন এবং পল্লবের ঈষৎ অন্তরাল ব্যতীত সে আলোক তাহার উপর তেমন কমনীয় কোমল ভাবে পড়ে না। নাটকের ঐ ক'টি পত্রে সখীবিরহিতা শকুন্তলা এতই সুস্পষ্ট-রূপে অসহায় অসম্পূর্ণ অনাবৃত -ভাবে চোখে পড়ে যে তাহার দিকে যেন ভালো করিয়া চাহিতে সংকোচ বোধ হয়; মাঝখানে আর্যা গৌতমীর আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকমাত্রেই মনে-মনে আরাম লাভ করে।

আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ— সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা— চেনা কঠিন হইতে পারে।

শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের

একমাত্র দুঃখ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনো পরিবর্তন হয় নাই? হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া। এখন হইতে অপরাহ্ণে আলবালে জল সেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোকতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে!

এখন সেই সখীভাবনির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদাকে মর্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারা তো ছায়া নহে; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই তো। তাহারা জীবন্ত, মূর্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে, এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে; অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না; এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক-এক দিন সেই অন্য-মনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

সংস্কৃত সাহিত্যে আর-একটি অনাদৃতা আছে। তাহার সহিত পাঠকদের পরিচয়সাধন করাইতে আমি কুণ্ঠিত। সে বড়ো কেহই নহে, সে কাদম্বরী কাহিনীর পত্রলেখা। সে যেখানে আসিয়া অতি স্বল্পস্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনোপ্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি

তাহার পক্ষে বড়ো সংকীর্ণ, একটু এ দিকে ও দিকে পা ফেলিলেই সংকট।

এই আখ্যায়িকার পত্রলেখা যে সুকুমার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে সেরূপ সম্বন্ধ আর কোনো সাহিত্যে কোথাও দেখি নাই। অথচ কবি অতি সহজে সরলচিত্তে এই অপূর্ব সম্বন্ধবন্ধনের অবতারণা করিয়াছেন, কোনোখানে এই উর্ণাতন্তুর প্রতি এতটুকু টান পড়ে নাই যাহাতে মুহূর্তেকের জন্য ছিন্ন হইবার আশঙ্কামাত্র ঘটিতে পারে।

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে কৈলাস নামে এক কঞ্চুকী প্রবেশ করিল— তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা— অনভিযৌবনা, মস্তকে ইন্দ্রগোপকীটের মতো রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দনতিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমলতনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য নূতন অঙ্কিত, এই তরুণী লাবণ্যপ্রভাপ্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া ক্বণিতমণিনূপুরাকুলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।

কঞ্চুকী প্রণাম করিয়া ক্ষিতিতলে দক্ষিণ কর রাখিয়া জ্ঞাপন করিল, কুমার, আপনার মাতা মহাদেবী বিলাসবতী জানাইতেছেন : এই কন্যা পরাজিত লুকুতেশ্বরের দুহিতা, বন্দিনী, ইহার নাম পত্রলেখা। এই অনাথ রাজদুহিতাকে আমি দুহিতানির্বিশেষে এতকাল পালন করিয়াছি, এক্ষণে ইহাকে তোমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম। ইহাকে সামান্য পরিজনের মতো দেখিয়ো না, বালিকার মতো লালন করিয়া নিজের চিত্তবৃত্তির মতো চাপল্য হইতে নিবারণ করিয়ো, শিষ্যার ন্যায় দেখিয়ো, সুহৃদের ন্যায় সমস্ত বিশ্রম্ভব্যাপারে ইহাকে অভ্যন্তরে লইয়ো, এবং এই কল্যাণীকে এমত-সকল কার্যে নিযুক্ত করিয়ো যাহাতে এ তোমার অতিচিরপরিচারিকা হইতে পারে।

কৈলাস এই কথা বলিতেই পত্রলেখা তাঁহাকে অভিজাত প্রণাম করিল এবং চন্দ্রাপীড় তাহাকে অনিমেষ লোচনে সুচিরকাল নিরীক্ষণ

করিয়া 'অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে' বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিংকরীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো। কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়! নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন।

কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন, এই গণ্ডির রেখামাত্র বাহিরে তাহাকে কোনোদিন টানেন নাই। হতভাগিনী বন্দিনীর প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কী হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনোদিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখিত্ব-পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।

অথচ সখিত্বের মধ্যে লেশমাত্র অন্তরাল ছিল না। কবি বলিতেছেন, পত্রলেখা সেই প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্রেই সেবারসসমুপজাতানন্দা হইয়া, দিন নাই, রাত্রি নাই, উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে, ছায়ার মতো রাজপুত্রের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। চন্দ্রাপীড়েরও তাহাকে দেখা অবধি প্রতিক্ষণে উপচীয়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল। প্রতিদিন ইহার প্রতি প্রসাদ রক্ষা করিলেন এবং সমস্ত বিশ্বাসকার্যে ইহাকে আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এই সম্বন্ধটি অপূর্ব সুমধুর, কিন্তু ইহার মধ্যে নারী-অধিকারের পূর্ণতা নাই। নারীর সহিত নারীর যেরূপ লজ্জাবোধহীন সখীসম্পর্ক থাকিতে পারে পুরুষের সহিত তাহার সেইরূপ অসংকোচ অনবচ্ছিন্ন নৈকট্যে

পত্রলেখার নারীমর্যাদার প্রতি কাদম্বরী-কাব্যের যে-একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাতে কি পাঠককে আঘাত করে না? কিসের আঘাত? আশঙ্কার নহে, সংশয়ের নহে। কারণ, কবি যদি আশঙ্কা-সংশয়েরও লেশমাত্র স্থান রাখিতেন তবে সেটা আমরা পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি কথঞ্চিৎ সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা এবং সন্দেহের দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পর্যন্ত নাই। পত্রলেখা তাহার অপূর্বসম্বন্ধ-বশত অন্তঃপুর তো ত্যাগই করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সমীপবর্তী হইলে স্বভাবতই যে-একটি সংকোচে সাধ্বসে এমন-কি, সহাস্য ছলনায় একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে ইহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই। সেই কারণেই এই অন্তঃপুরবিচ্যুতা অন্তঃপুরিকার জন্য সর্বদাই ক্ষোভ জন্মিতে থাকে।

চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার নৈকট্যও অসামান্য। দিগ্‌বিজয়যাত্রার সময় একই হস্তিপৃষ্ঠে পত্রলেখাকে সম্মুখে বসাইয়া রাজপুত্র আসন গ্রহণ করেন। শিবিরে রাত্রিকালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজ শয্যার অনতিদূরে শয়ননিষণ্ণ পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন তখন নিকটে ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।

অবশেষে কাদম্বরীর সহিত চন্দ্রাপীড়ের যখন প্রণয় সংঘটন হইল তখনো পত্রলেখা আপন ক্ষুদ্র স্থানটুকুর মধ্যে অব্যাহতভাবে রহিল, কারণ, পুরুষচিত্তে নারী যতটা আসন পাইতে পারে তাহার সংকীর্ণতম প্রান্তটুকু মাত্র সে অধিকার করিয়াছিল; সেখানে যখন মহামহোৎসবের জন্য স্থান করিতে হইল তখন ঐটুকু প্রান্ত হইতে বঞ্চিত করা আবশ্যকই হইল না।

পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর ঈর্ষার আভাসমাত্রও ছিল না। এমন-কি, চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার প্রীতিসম্বন্ধ বলিয়াই কাদম্বরী

তাহাকে প্রিয়সখীজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিল। কাদম্বরী-কাব্যের মধ্যে পত্রলেখা যে অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে সেখানে ঈর্ষা সংশয় সংকট বেদনা কিছুই নাই; তাহা স্বর্গের ন্যায় নিষ্কণ্টক, অথচ সেখানে স্বর্গের অমৃতবিন্দু কই!

প্রেমের উচ্ছ্বসিত-অমৃত-পান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ঘ্রাণেও কি কোনো দিনের জন্য তাহার কোনো-একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! সে কি চন্দ্রাপীড়ের ছায়া! রাজপুত্রের তপ্ত যৌবনের তাপটুকুমাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই! কবি সে প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা।

পত্রলেখা যখন কিয়ৎকাল কাদম্বরীর সহিত একত্রবাসের পর বার্তাসহ চন্দ্রাপীড়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, যখন স্মিতহাস্যের দ্বারা দূর হইতেই চন্দ্রাপীড়ের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া সে নমস্কার করিল, তখন পত্রলেখা প্রকৃতিবল্লভা হইলেও কাদম্বরীর নিকট হইতে প্রসাদলব্ধ আর একটি সৌভাগ্যের ন্যায় বল্লভতরতা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে অতিশয় আদর দেখাইয়া যুবরাজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

চন্দ্রাপীড়ের এই আদর এই আলিঙ্গনের দ্বারাই পত্রলেখা কবি-কর্তৃক অনাদৃতা। আমরা বলি, কবি অন্ধ। কাদম্বরী এবং মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়তৃষার্ত চিরবঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেছে, সে কথা তিনি একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন। বাণভট্টের কল্পনা মুক্তহস্ত; অস্থানে অপাত্রেও তিনি অজস্র বর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। কেবল তাঁহার সমস্ত কৃপণতা এই বিগতনাথা রাজদুহিতার প্রতি। তিনি পক্ষপাতদূষিত পরম

অজ্ঞতাবশত পত্রলেখার হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন, তরঙ্গিনীকে তিনি যে পর্যন্ত আসিবার অনুমতি করিয়াছেন সে সেই পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া আছে, পূর্ণ-চন্দ্রোদয়েও সে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করে নাই। তাই কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয়, অন্য-সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

ধম্মপদং

অর্থাৎ ধম্মপদ-নামক পালিগ্রন্থের মূল অন্বয় সংস্কৃতব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু -কর্তৃক সম্পাদিত প্রণীত ও প্রকাশিত

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধম্মপদ তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদ গ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে-সকল উপদেশ আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন ; অন্তত এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই-সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত পঞ্চতন্ত্র মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাংলা-অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই-সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার করিয়া, সুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন ; যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব, ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কী ধম্মপদে কী গীতায় এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি। সেইজন্য ধম্মপদ গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীন ভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি।

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস এক ভাবের হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্বে অন্যত্র কোথাও বলিয়াছি। এইজন্য যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মিলে না তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন কোনোদিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং, এ দেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা

বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কী লইয়া? পূর্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম কী তাহা লইয়া তর্কের সীমা নাই, এবং ভারতবর্ষে ধর্মের বাহ্যরূপ যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।

য়ুরোপীয় নেশন-গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য।

য়ুরোপে ধর্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীণভাবে কাজ করিয়াছে। ধর্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে।

আমাদের দেশে মোগল-শাসন-কালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে

ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।

পলিটিক্‌স্ এবং নেশন কথাটা যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিক্‌স্ এবং নেশন কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এজন্য ধর্মকে ইংরাজি রিলিজন-রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুল করিয়া বসি। এইজন্য ধর্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য এ কথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে।

মানুষ মুখ্যভাবে কোন্ ফলের প্রতি লক্ষ করিয়া কর্ম করে তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। 'লাভ করিব' এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়, 'কল্যাণ করিব' এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আসে; সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। যে ব্যক্তি লাভকেই মানে তাহার পক্ষে ঐ-সকল বাধার অস্তিত্ব নাই।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব। অন্তত ভারতবর্ষ লাভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে, কী বুঝিয়া মানিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা তাহার ভালো মন্দ কর্ম কিছুই নাই। আত্ম-অনাত্মের যোগে ভালো মন্দ সকল কর্মের উদ্ভব। অতএব গোড়ায় এই আত্ম-অনাত্মের সত্যসম্বন্ধনির্ণয় আবশ্যক। এই সম্বন্ধনির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে আশ্চর্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাত্মের মধ্যে কোনো সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্তু যদি এক ছাড়া দুই না থাকে তবে তো ভালোমন্দের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে দুই করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্মের ভালোমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর-এক সম্প্রদায় বলেন, এই-যে সংসার আবর্তিত হইতেছে আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও দুঃখ পাইতেছি, এক কর্মের দ্বারা আর-এক কর্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিতেছি— এই কর্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র শ্রেয়।

কিন্তু, তবে তো সকল কর্ম বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয় যাহাতে কর্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ রাখিয়া কোন্ কর্ম শুভ, কোন্ কর্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম তাঁহার আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই সার্থকতার উপায়ও পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে খর্ব করিতে না পারিলে ভগবানের

ইচ্ছাকে অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ করিয়াই কর্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাঁহারা অদ্বৈতানন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উদ্যত, যাঁহারা কর্মের অনন্ত শৃঙ্খল হইতে মুক্তিপ্রার্থী তাঁহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান, ভগবানের প্রেমে যাঁহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করেন তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হউক, সে তত্ত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যত দূর পর্যন্তই যাওয়া যাক, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই তত্ত্বকে কর্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড়ো কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসংগত বোধে কোনোদিন ভীরুতাবশত কথার কথা করিয়া রাখে নাই। এইজন্য এক সময়ে যে ভারতবর্ষ মাংসাশী ছিল সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যে য়ুরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্তনের মূলে সুবিধাকেই লক্ষ করেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তি-সহকারে ভারতবর্ষে আর্থিক কারণে গোমাংসভক্ষণ রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান সত্ত্বেও অন্য-সকল মাংসাহারও এমন-কি, মৎস্যভোজনও, ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে লোপ পাইয়াছে। কোনো প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন

করিয়া পালিত হইতেছে যে তাহা সুবিধার তরফ হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক, তত্ত্বজ্ঞান যত দূর পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ কর্ম্মকেও তত দূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্ম্মের ভেদ-সাধন করে নাই। এইজন্য আমাদের দেশে কর্ম্মই ধর্ম্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্ম্মমাত্রের চরম লক্ষ্য কর্ম্ম হইতে মুক্তি, এবং মুক্তির উদ্দেশে কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাক্, কর্ম্মে আমাদের ঐক্য আছে। অদ্বৈতানুভূতির মধ্যেই মুক্তি বলো, আর বিগত-সংস্কার নির্ব্বাণের মধ্যেই মুক্তি বলো, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বলো, প্রকৃতিভেদে যে মুক্তির আদর্শই যাহাকে আকর্ষণ করুক-না কেন, সেই মুক্তি-পথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্ম্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম্ম তেমনি কর্ম্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

য়ুরোপ কর্ম্মকে কর্ম্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপে কর্ম্মসংগ্রামের অন্ত নাই; সেখানে কর্ম্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে। কৃতকার্য্য হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। য়ুরোপের ইতিহাস কর্ম্মেরই ইতিহাস।

য়ুরোপ কর্ম্মকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম্ম করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে: আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব— সেই স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অন্যের কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে কেবল সেইখানেই আইনের প্রয়োজন, এই আইনের শাসন-ব্যতিরেকে সমাজে

প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য য়ুরোপীয় সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি সেখানে কর্মই বস্তুত কর্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর-এক বাসনাকে, এক কর্ম হইতে আর-এক কর্মকে বহন করিয়া চলি ; হাঁফ ছাড়িবার সময় পাই না ; তাহার পরে সেই কর্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই-যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাতেই য়ুরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব খর্ব করিয়াছি। বাসনা যে কোনোদিনই শান্তিতে লইয়া যায় না, পরিণামহীন কর্মচেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাত্ম্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। য়ুরোপ বলে, বাসনা যে কোনো পরিণামে লইয়া যায় না, তাহা নিয়তই যে আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব। য়ুরোপ বলে, প্রাপ্তি নহে, সন্ধানই আনন্দ। ভারতবর্ষ বলে, তোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল তাহাতে আনন্দ নাই ; কারণ, সে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই। সে প্রাপ্তি আমাদিগকে অন্য প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া ভ্রম করি, এবং তাহার পরে দেখিতে পাই তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শান্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই ভ্রমে তাহা হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করে— আমাদিগকে কোনোমতেই মুক্তি দেয় না। যে বাসনা সেই মুক্তির বিরোধী সেই বাসনাকে আমরা হীনবল

করিয়া দিব। আমরা কর্মকে জয়ী করিব না, কর্মের উপরে জয়ী হইব।

আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়মসংযম, আমাদের বৈরাগী-ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত, সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে, আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, বুদ্ধিপূর্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য।

সংস্কৃত ভাষায় 'ভব' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'হওয়া'। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। য়ুরোপ খুব করিয়া হইতে চায়; আমরা একেবারেই না হইতে চাই।

এমনতরো ভয়ংকর স্বাধীনতার চেষ্টা ভালো কি মন্দ তাহার মীমাংসা করা বড়ো কঠিন; এরূপ অনাসক্তি যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, আসক্ত লোকের সংসর্গে তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে, এমন-কি, তাহাদের মারা যাইবার কথা। অপর পক্ষে বলিবার কথা এই যে, মরা-বাঁচাই সার্থকতার চরম পরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীনতার বিশেষ একটি আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় প্রায় তাহার আত্মহত্যার জো হইয়াছিল— যদিই সে মরিত তবু কি তাহার গৌরব কম হইত? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটা লোক প্রাণ দিল, আর-একজন তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল— তাই বলিয়া কি উদ্ধারচেষ্টাকে মৃত্যু-পরিণামের দ্বারা বিচার করিয়া ধিক্কার দিতে হইবে? পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্মের দৌরাত্ম্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে; আজ ভারতবর্ষ যদি, জড়ভাবে নহে, মূঢ়ভাবে নহে, জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবন্ধ-মুক্তির আদর্শকে, শান্তির জয়পতাকাকে, এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে অবিচলিত দৃঢ় হস্তে

ধারণ করিয়া যরিতে পারিত, তবে অন্য-সকলে তাহাকে যতই ধিক্কার দিক, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার স্থান নহে। মোট কথা এই, য়ুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন— আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গবর্মেণ্টের দ্বারে ভিক্ষা-কার্যের মধ্যেই আবদ্ধ; আর-কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই। সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জন-কয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধম্মপদের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইবেন না, একে একে বৌদ্ধশাস্ত্রসকলের অনুবাদ বাহির করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলঙ্ক মোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলেই ভালো হয়; যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে তবে অন্যায় হয়, কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে; এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে-সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলে আছে—

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া।

চারুবাবু ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন: মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়। যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন 'ধর্মসমূহ মনঃপূর্বংগম মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময়' তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা করিতেন। 'মনই ধর্ম-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলিলে ভালো অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥

ইহার অনুবাদে আছে: আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।

'এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না' বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অনুবাদ নহে। বোধ হয়, 'যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না' বলিলে মূলের অনুগত হইত; অর্থানুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না। যথা: আমাকে গালি দিল,

আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে তাহাদের বৈর শান্ত হয়।

এই গ্রন্থে মূলের অন্বয়, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অনুবাদ থাকাতে ইহা পাঠকদের ও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলে পালিভাষা-অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক, সম্প্রতি ত্রিবেণী-কপিলাশ্রম হইতে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী -কর্তৃক ধম্মপদং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আশা করি, এই গ্রন্থখানিও এই ধর্মশাস্ত্র-প্রচারের সাহায্য করিবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

গ্রন্থপরিচয়

প্রথম প্রবন্ধ ব্যতীত এই গ্রন্থে সংকলিত অন্যান্য প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের ভূমিকা, ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত। প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নীচে সংকলিত হইল :

১ রামায়ণ ॥ 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা। জুলাই ১৯০৪
২ মেঘদূত ॥ সাহিত্য। অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৩ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ॥ বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩০৮*
৪ শকুন্তলা ॥ বঙ্গদর্শন। আশ্বিন ১৩০৯*
৫ কাদম্বরীচিত্র ॥ প্রদীপ। মাঘ ১৩০৬
৬ কাব্যের উপেক্ষিতা ॥ ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
৭ ধম্মপদং ॥ বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় দেখা যায় (বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৬, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ তুলনীয়)—

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড এনীড ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃদ্‌পদ্ম-দলস্থ ও হৃদ্‌পদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর ও ভর্জিল আপন আপন দেশ-কালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন।

ইত্যাদি

পরবর্তী এক অনুচ্ছেদে (পৃ. ৬, সর্বশেষ অনুচ্ছেদ তুলনীয়)—

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও রোম্

---

* ২৩ অগ্রহায়ণ তারিখে 'আলোচনাসমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত।'

* আলোচনাসমিতির অধিবেশনে পঠিত।

গ্রন্থে সংকলন-কালে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধেরই পূর্ব-মুদ্রিত পাঠ হইতে বহু অংশ ত্যাগ করিয়াছেন।

তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না।

ইত্যাদি

প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশগুলি 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে প্রথমাবধি যেভাবে মুদ্রিত হইতেছে তাহাতে দেখা যায়, 'ভর্জিলের এনীড্ কাব্য রামায়ণ-মহাভারতের সগোত্র' কবি এরূপ অভিমত পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভর্জিলের কাব্য-সম্পর্কিত সকল উক্তি বর্জিত হইয়াছে। অথচ বর্তমান গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় শেষ বা তৎপূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে 'গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে' বা 'য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে' এরূপ উক্তি রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ভর্জিলের 'এনীড্' কাব্যের উল্লেখ বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হোমরের 'অডিসী' মহাকাব্যের উল্লেখ হয়তো রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল।

'মেঘদূত' প্রবন্ধ সাময়িক পত্র হইতে গ্রন্থে সংকলন-কালে সূচনাংশ বর্জিত হইয়াছে; সেই কয়টি অনুচ্ছেদ বর্তমানে সংকলিত হইল—

আমি ইতিপূর্বেই মেঘদূত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অনেক কথা বলা হয় নাই। এমন যে কিছু নূতন কথা বলিবার আছে তাহা নয়— কিছু যে বানাইয়া বড়ো করিয়া বলিব সে ক্ষমতাও নাই— আসল কথা যেটা মনে উদয় হয় সেইটে বলিতে ইচ্ছা করি।

অনেক দিন হইল, বাল্যকালে গঙ্গার ধারের এক বাগানে বসিয়া দাদার মুখে যখন শুনিয়াছিলাম 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং' তখন বোধ হয় উপক্রমণিকা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি; সংস্কৃত শব্দগুলি কানে কতকটা পরিচিত ঠেকে, মনে হয় যেন ভাবটা একটু একটু ধরিতে পারিতেছি, কিন্তু তবু কিছুই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। অর্থাৎ, যে

দুটা-একটা শব্দ বুঝা যায়, তাহার সহিত সংস্কৃত ছন্দের ঝংকার মিশ্রিত হইয়া মনের মধ্যে কেবল একটা সংগীত উৎপন্ন করিত ; তাহাকে ভাষায় পরিণত করা দুরূহ। মেঘদূতের মেঘমন্দ্র ছন্দ এবং 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং' এই ছত্রটি শুনিয়া প্রাচীন কালের এক ঘনবর্ষার দিন আমার উপরে ঘনাইয়া আসিল। যেমন দূর হিমালয়ের শিখরে যেদিন বর্ষা নামিয়া আসে সেদিন হঠাৎ গ্রামের প্রান্তে সৈকতশয্যাশায়ী শীর্ণ নদীস্রোতটুকুর মধ্যে একটা স্ফীতি উপস্থিত হয়, তেমনি সেই উজ্জয়িনীর অতিপুরাতন কোন্-এক প্রথম আষাঢ়ের বর্ষা এই এক যুগপ্রান্তবর্তী বালকের হৃদয়ে আপনার সংবাদ প্রেরণ করিল। হঠাৎ পরিপূর্ণ ছন্দের স্রোতে এবং ধ্বনির গাম্ভীর্যে হৃদয়ের দুই কূল নিম হইয়া গেল।

সহস্র বৎসর পূর্বেও যে গ্রীষ্মতপ্ত গ্রীষ্মের অবসানে আষাঢ়ের প্রথম দিবস আপনার আকাশ-ভরা নবমেঘ এবং দিগন্তব্যাপী স্নিগ্ধ অন্ধকার লইয়া জনপদবধূদিগের প্রীতিপূর্ণ নেত্রের উপরে আবির্ভূত হইত, সে বিষয়ে বিশেষ কোনোও প্রমাণের আবশ্যক করে না। কিন্তু যখন সেই আষাঢ়, সেই নববর্ষা, সেই চকিত বিদ্যুতের কথা প্রাচীন শ্লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তখন হৃদয়ের মধ্যে একপ্রকার বিস্ময়মিশ্রিত ব্যাকুলতা জন্মে। সেদিনকার বর্ষা এবং বর্ষাবেষ্টিত মানবহৃদয় মনের মধ্যে অস্পষ্ট আলোকে জীবিত হইয়া উঠে। কবির শ্লোক সেই সঞ্জীবনীমন্ত্র।

ব্যাকুলতা কেন জন্মে? বহুপূর্বকালের সুখস্মৃতির যে ব্যাকুলতা, এও সেই ব্যাকুলতা। যেমন অতীত জীবনের কথায় মনে হয়, তখন কত সুখ ছিল, এখন আর তাহা নাই। মনে হয়, তখন কত সুখ হইতে পারিত, এখন সে সম্ভাবনা চলিয়া গেছে। তখন যে দিন যে জীবন আমার ছিল, তাহা চিরকালের মতো লুপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কাব্য যে অতীত স্মরণ করাইয়া দেয়, সেও এইরূপ। মনে হয় যেন আমি সেদিনের মধ্যে কোনো এক ভাবে ছিলাম। কিংবা মনে হয় যেন আমি সেই সেকালের মধ্যে থাকিতে পারিতাম। এই যে হৃদয়ের এক অংশ কাব্যসূত্রে সেই দিনের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে এবং অবশিষ্ট অংশ তাহাকে না পাইয়া তাহার জন্য দুই বাহু বাড়াইতেছে, ইহাই ব্যাকুলতার কারণ।

[সাহিত্য। অগ্রহায়ণ ১২৯৮

গ্রন্থের পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় যে ইংরাজ কবির কবিতা-বিশেষের প্রসঙ্গ আছে তিনি Matthew Arnold (1822-1888); তাঁহার ISOLATION কবিতার সূচনা এইরূপ :

Yes ! in the sea of life enisled,
with echoing straits between us thrown,
dotting the shoreless watery wild,
we mortal millions live *alone*.

দশ ছত্র পরে এরূপ উক্তি আছে :

for surely once, they feel, we were
parts of a single continent !

—

₹ 90

ISBN 978-81-7522-062-1